গাজওয়াতুল হিন্দ

এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

গাজওয়াতুল হিন্দের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

অন্তিম প্রকাশনী

গাজওয়াতুল হিন্দের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

লেখকঃ হাবীবুল্লাহ মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর

সম্পাদকঃ জিহাদুল ইসলাম

গ্রন্থস্বত্বঃ অন্তিম প্রকাশনী

অনলাইন প্রকাশঃ ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২০ইং এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে এটি বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।
সংস্করণ প্রকাশঃ ১০ই জুন, ২০২৫ ঈসায়ী

প্রকাশনায়ঃ অন্তিম প্রকাশনী

হাদিয়াঃ ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

অন্যান্য বইগুলোঃ https://cutt.ly/akhirujjamanbooks
https://dl.gazwatulhind.com

যোগাযোগঃ backup.2024@hotmail.com

বই কিনুনঃ http://cutt.ly/ontim_prokashoni

GAZWATUL HIND ER SONGKHIPTO ALOCHONA WRITTEN BY HABIBULLAH MAHMUD BIN ABDUL QADIR, EDITED BY JIHADUL ISLAM. PUBLISHED BY ONTIM PROKASHONI. COPYRIGHT: PUBLISHER. 1st OFFICIALLY PUBLISHED ON INTERNET: 12th SEPTEMBER, 2020 ISAYI. HARD COPY EDITION PUBLISHED ON: 10th JUNE, 2025 ISAYI

সূচিপত্র

ক্র: নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
০১.	সম্পাদকের কথা	০৪
০২.	লেখক পরিচিতি	০৭
০৩.	মূল আলোচনা	০৮
০৪.	কখন হবে গাজওয়াতুল হিন্দ	১০
০৫.	হাদিস	১১
০৬.	কীভাবে হবে গাজওয়াতুল হিন্দ	১৩
০৭.	হামলার পূর্বে	১৪
০৮.	যে বিষয়টি আমাদের অবশ্যই লক্ষণীয়	১৭
০৯.	গাজওয়াতুল হিন্দের প্রস্তুতি	১৭
১০.	যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সমূহ	১৯
১১.	যুদ্ধে বিজয়ের প্রধান শর্ত	১৯
১২.	যুদ্ধের সেনাপতির গুণাবলী	২০
১৩.	সর্বশেষ বিষয়	২০
১৪.	নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের সচেতনতা	২১
১৫.	কর্মীদের সঠিক আনুগত্য	২২
১৬.	কীভাবে সমাধান	২৩
১৭.	গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোর সারসংক্ষেপ আলোচনা	২৪

সম্পাদকের কথা

ইন্নাল হামদালিল্লাহ, ওয়াছ ছলা-তু ওয়াস সালা-মু 'আলা রসূলিল্লাহ। পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি সকল কিছু উপর ক্ষমতাবান।

সকল প্রশংসা সেই মহান সত্তা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রিয় নাবী ও রসূল মুহাম্মাদ (ছল্লালহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর, যিনি মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন।

বর্তমান সময়ের বহুল আলোচিত ও জনপ্রিয় 'গাজওয়াতুল হিন্দ এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা' নামক গ্রন্থটি বই আকারে প্রকাশিত করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা তাওফীক দিয়েছেন এজন্য আবারো শুকরিয়া আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। এই গ্রন্থটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোকপাত করে, যা নাবী ছল্লালহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বর্ণিত শেষ জামানার অন্যতম প্রধান ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর মধ্যে একটি; আর তা এই বইয়ের নাম থেকেই অনুমান করা যায়, অর্থাৎ 'গাজওয়াতুল হিন্দ বা হিন্দের যুদ্ধ'। বইটিতে হিন্দের যুদ্ধের অনেক হাদিসসমূহ বর্ণনার সাথে সেই যুদ্ধের আগের অবস্থা, যুদ্ধ শুরুর প্রেক্ষাপট ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে, যেন একটি গল্পের ঘটনা প্রবাহ। এই বিষয়টিই এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ও তুমুল জনপ্রিয় হয়েছে। এতে বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলোর কথা উল্লেখ হয়েছে। বাংলাদেশের অন্যতম স্বৈরাচারী শক্তিশালী সরকার আওয়ামীলীগেরও যে পতন হবে; যা কেউ কল্পনায়ও আনতে পারেনি তার কথাটিই এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল! এবং অবাক করার বিষয় হচ্ছে এই বইটি লেখা হয় ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন লেখক কারাবন্দী অবস্থায় কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কারাগারে দিন কাটাচ্ছিলেন এবং ধৈর্যের কঠিন পরীক্ষা অতিক্রম করছিলেন।

পরবর্তীতে, এটি অনলাইনে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। সেই জনপ্রিয়তার ফলস্বরূপ, বর্তমানে এটি পুস্তক আকারে আপনাদের হাতে তুলে দেওয়ার একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করছি।

তার কারাবন্দী হওয়ার মূল কারণও ছিল সঠিক ইসলামের দাওয়াহ। মানুষকে আগত বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করা এবং মানুষকে ইসলামের দিকে, তাওহীদের দিকে ধাবিত করার জন্য তিনি ২০১৭ সাল থেকে নিরলস পরিশ্রম করতে থাকেন। পরবর্তীতে উক্ত কারণে তৎকালীন সরকারের রোষানলে পরে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিট তাকে গ্রেফতার করে এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইনে মামলা দায়ের করে জেলে পাঠায়। তিনি শারীরিকভাবে একজন অসুস্থ ব্যক্তি হওয়ার পরও সরকার-প্রশাসন তাকে কোন ছাড় দেন নি। এরপর ২০২০ সালের জুলাই মাসে তিনি কারামুক্তি পান। এই কঠিন সময়কালের মাঝেই তিনি এই বইটি লিখেন। জেলখানায় থাকা অবস্থাতেই এই বইটি প্রকাশ করার জন্য বাহিরে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন এবং তার কারাবন্দী অবস্থাতেই বইটি সীমিত আকারে অনলাইনে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে লেখকের কারামুক্তির পর তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে পরিপূর্ণ ভাবে অনলাইনে প্রকাশিত হয়। এজন্য অনলাইনে প্রকাশের সময় লেখক পরিচিতি কিংবা তার নামও ব্যবহার করা হয়নি।

২০২০-২১ সালে টেলিগ্রামে ও ফেসবুকে পিডিএফ আকারে প্রকাশিত হয় "গাজওয়াতুল হিন্দের সংক্ষিপ্ত আলোচনা" বইটি। যা এখনো সংরক্ষিত রয়েছে সেই তারিখগুলোতে!

টেলিগ্রাম লিংক-

1- https://t.me/mahmudgazwatulhind/11
2- https://t.me/mahmudgazwatulhind/36
3- https://t.me/mahmudgazwatulhind/101
4- https://t.me/mahmudgazwatulhind/157

ফেসবুক লিংক-

1- https://www.facebook.com/share/p/14z4aVsEfz/
2- https://www.facebook.com/share/p/153KniGZsT/

২০২১ সালে আবারো ফেসবুকে প্রচার-

1- https://www.facebook.com/share/p/1Q5UPQ2VTM/
2- https://www.facebook.com/share/p/1BmgmMxQkv/

এছাড়াও বর্তমান সময় পর্যন্ত ওয়েবসাইট ও গুগল ড্রাইভ থেকে অসংখ্য ডাউনলোড হয়েছে ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের হাত ধরে গ্রন্থটি প্রচারের মাধ্যমে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। সম্প্রতি এবছর ভারতীয় মিডিয়াতেও এই নিয়ে একটি নিউজ রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। ইউটিউবে সেই নিউজ রিপোর্ট দেখতে ভিজিট করুন-

https://www.youtube.com/live/VeP1mL3b_s0

এখন সেই বইটিই পুস্তক আকারে ছাপা হচ্ছে। অতঃপর, আশা করি এই বইটি পাঠকদের গাজওয়াতুল হিন্দ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দিতে সাহায্য করবে। এখানে হাদিস এবং তার প্রেক্ষাপটের আলোকে এই যুদ্ধের তাৎপর্য, সময়কাল এবং এর সাথে জড়িত বিভিন্ন আলামত বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে হাদিসের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো যেভাবে বাস্তবের সাথে মিলে যাচ্ছে, তাতে আমাদের উচিত সকল প্রকার প্রস্তুতি নিয়ে থাকা। নেতৃত্বের সচেতনতা ও কর্মীদের সঠিক আনুগত্যের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে, কারণ যেকোনো যুদ্ধের বিজয় এবং মুসলিম সমাজের কল্যাণ এর উপরই নির্ভরশীল। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর জুলুম করেন না এবং তাঁর সাহায্য সব সময় মুমিনদের সাথে থাকে।

আশা রাখি, এই বইটি পাঠকদের গাজওয়াতুল হিন্দ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের প্রস্তুত করার জন্য অনুপ্রাণিত করবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দিন এবং তাঁর নির্দেশিত পথে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক পরিচিতি

নাম মাহমুদ। ডাকনাম জুয়েল মাহমুদ, তাঁর স্বজনদের অনেকে তাকে সোহেল নামেও ডাকে এবং বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলের মানুষই তাকে "হাবীবুল্লাহ মাহমুদ" নামে চিনে। পিতা আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন এবং জননী সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন।

জন্ম: তিনি ১৪১৬ হিজরীর জুমাদিউল আওয়াল মাসের ৬ তারিখ (ঈসায়ী ১৯৯৫ সালের ১লা অক্টোবর) রবিবার সকালে নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার পাঁকা ইউনিয়নের অন্তর্গত উত্তর গাঁওপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা-মাতার দিক থেকে কয়েক জন উর্ধ্বতন পুরুষের নাম:

■ পিতার দিক হতে- আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন বিন আব্দুল গফুর বিন খাবীর বিন আব্দুল বাকী বিন মাওলানা নজির উদ্দিন আল-যোবায়েরী (রহঃ) বিন মোল্লা আব্দুছ ছাত্তার মুর্শিদাবাদী বিন শাইখ আবদে হাকিম ইউসুফী (রহিঃ)। যিনি ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের কিছু সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধাদের নিয়ে 'বদরী কাফেলা' নামে একটি সংগঠন তৈরী করেন এবং তাঁর মাধ্যমে ইংরেজদের সাথে লড়াই করেন। অতঃপর ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মার্চের ৩ তারিখে তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দী হন এবং কলিকাতায় ইংরেজদের কারাগারে বন্দী থাকেন। পরিশেষে তিনি ইংরেজদের নির্যাতনের শিকার হয়ে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই বাদ আসর কারাগারে ইন্তেকাল করেন।[১]

■ মাতার দিক হতে- সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন বিন ইব্রাহীম বিন কাসেম মোল্লা ওরফে কালু মোল্লা বিন বাহলুল বিন নূর উদ্দিন হেরা পাঠান, যিনি পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের অধিবাসী ছিলেন।

শিক্ষা জীবন: তিনি স্থানীয় সালিমপুর মালিগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া-লেখা করেন। অতঃপর তাঁর নানার সহযোগিতায় স্থানীয় গাঁওপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে কুরআনের নাজরানা শেষ করে তিনি কিছু অংশ মুখস্থও করেন। অতঃপর বাঘা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে তিনি ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

---

১. ভারতবর্ষের মুসলিমদের ইতিহাস (মুসলিম শাসন), লেখক: আব্দুল করিম মোতেম, (পৃষ্ঠা ৩০৬)।

মূল আলোচনা

(বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম)

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নাবী ও রসূল মুহাম্মাদ (ছল্লাল্লহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর।

যখন এই পৃথিবীর অস্তিত্ব বলতে কিছুই ছিল না। ঠিক তখনই সেই মূহুর্তে মহা মহিমাময় পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছে করলেন, এতো সুন্দর পৃথিবীর সৃষ্টির যেখানে মহান আল্লাহ তা'আলার দাসগণ নিরাপদে বসাবস করবে এবং শুধু মাত্র এক আল্লাহ তা'আলারই দাসত্ব করবে, আর এই সকল দাস-দাসীদের প্রয়োজনার্থে এই আসমান-যমিনকে সুসজ্জিত সাজিয়ে দিলেন সকল প্রকার সুন্দর ও সুশোভিত সরঞ্জাম দ্বারা। যেন মহান আল্লাহ তা'আলার দাস-দাসীগণের পৃথিবীতে বসবাসে কোন সমস্যায় কঠিন বাধাগ্রস্থ না হতে হয়, আর সেই সাথে তাদের জন্য দিয়ে দিলেন অফুরন্ত জীবিকা। যেন তারা কোন কিছুতেই অভাব অনুভব না করে। এভাবেই পৃথিবীর সৌন্দর্য দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে পৃথিবী। এভাবেই ক্রমান্বয়ে পৃথিবীতে জন্ম লাভের মাধ্যমে বৃদ্ধি হতে থাকে মানুষ। আসতে থাকে অসংখ্য নাবী ও রসূল, সে সাথে আসমানী কিতাব। ধীরে ধীরে অধিকাংশ মানুষই ভুলতে থাকে তাদের সৃষ্টির ইতিহাসের কথা। ভুলে যায়, এক সময় তাদের অস্তিত্বই ছিল না। অস্তিত্ব ছিল না এ মায়াময় পৃথিবীর, ভুলতে থাকে তারা এ কথা। এই অস্তিত্ব দান করেছেন সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালাই আর নির্দিষ্ট কোন একদিন এর ধ্বংসও সুনিশ্চিত। কেননা, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই চিরঞ্জীব, যার ধ্বংস নেই। আর এ কথাই মানব জাতিকে বারবার স্মরণ করে দিয়েছে আল্লাহর প্রেরিত নাবী-রসূলগণ। আর ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে গেছেন শেষ জামানার আগমনকারী আখেরী নাবী মুহাম্মাদ (ছল্লাল্লহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর। তবুও কী এসকল অজ্ঞ ও ত্বরাপ্রবণ মানবজাতি পয়গম্বরদের কথা বিশ্বাস করতে চায়? যতক্ষণ না পয়গম্বরদের ভবিষ্যদ্বাণী স্বচক্ষে ফলে যেতে দেখবে, ততক্ষণ তারা তা মানতে নারাজ আর এজন্য নাবী-রসূলদেরকে মিথ্যাবাদী অপবাদও দিয়েছে অনেক দাম্ভিক, অহংকারী সম্প্রদায়। ফলে তাদের অধিকাংশকেই ধ্বংস করেও দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা। অবশ্য তা দেখে শিক্ষাও গ্রহণ করেছে অনেকেই। কালের

পরিবর্তনে যখন ক্রমান্বয়ে চলে আসলো শেষ জামানা, মানব যখন সুশৃঙ্খল জাতি থেকে বিশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত হল, যখন বৃদ্ধি পেল অসভ্য ও বর্বরতা, মানুষ যখন অন্ধারে পথহারা-দিশেহারা দৌড়ে পৌছে গিয়েছিল অগ্নির দারপ্রান্তে, ঠিক সেই সময়ে এই সকল মানবদের সঠিক পথের দিশা দিয়ে অসভ্য, বর্বরতা দূর করে তাদের মাঝে হেদায়েতের আলো জ্বালিয়ে দিলেন শেষ যামানার আগমন কারী আখিরী নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)। মাত্র ২৩টি বছরের ব্যবধানে অর্ধ জাহানে মানবদের মাঝে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিয়ে বিশ্ববাসীকে উপহার দিলেন একটি সময়। যার নাম 'খাইরাল কুরুন' তথা পৃথিবীর সর্বোত্তম যুগ। এ কথা সুস্পষ্ট যে, মুহাম্মাদ (ﷺ)-ই আখেরী তথা শেষ নবী, আর কোন নবী-রসূল আসবে না। আসার সম্ভবনাও নেই। আর তার প্রয়োজনও নেই। কেননা, একমাত্র মুহাম্মাদ (ﷺ)-ই হলো শেষ যামানার শেষ নবী। এরপর আর নাবী আগমনের কোন যামানাও নেই, নাবী-রসূল আগমনের প্রয়োজনও নেই। এখন পৃথিবীর শেষ গন্তব্য 'কিয়ামত'। মুহাম্মাদ (ﷺ) এরশাদ করেন, আমি আর কিয়ামতের মাঝে এরূপ ব্যবধান একথা বলে তিনি তার তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল একত্র করে দেখান। তিনি আরো বলেন, হযরত ইরবাজ সারিয়া (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং শেষ নবী। (<u>মুসতাদরাকে হাকেম</u>)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন, আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নাবীগণের দৃষ্টান্ত এমন যেমন এক ব্যক্তি ঘর বানিয়েছে এবং তার মধ্যে সকল প্রকার কারুকার্য ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ঘরে কোন এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দিয়েছে। এখন লোকেরা চারদিকে ঘুরে দেখে ঘরের সৌন্দর্য প্রশংসা করে কিন্তু এই কথা বলে যে, এই জায়গায় একটি ইট কেন রাখা হল না? সুতরাং, আমিই সেই ইট এবং আমিই শেষ নাবী। (<u>বুখারী, অধ্যায়ঃ খতামান্নাবীই</u>)
অন্যান্য নবী রসূলগণ যেমন আহমাদ নামে আখেরী নাবী আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে গিয়েছিলেন, তদরূপ আমাদের নেতা আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) ও শেষ যামানার শেয সময়ে কিয়ামাত ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে গেছেন। যার মধ্যে গাজওয়াতুল হিন্দ তথা হিন্দুস্থানের যুদ্ধও একটি। সে সম্পর্কে রসূল (ﷺ) এর হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তা হলো, আবু হুরাইরা (রা.)

থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাদের থেকে হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। কাজেই আমি যদি সেই যুদ্ধের নাগাল পেয়ে যাই, তাহলে আমি তাতে আমার জীবন ও সম্পদ ব্যয় করে ফেলবো। যদি নিহত হই তাহলে আমি শ্রেষ্ঠতর শহীদের অন্তর্ভুক্ত হব। আর যদি আমি ফিরে আসি, তাহলে আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রাপ্ত আবু হুরাইরা হয়ে যাব। (সুনানে নাসায়ী, খন্ড-৬, পৃঃ ৪২; কিতাবুল ফিরদাউস, ৮৭৪)

কখন হবে গাজওয়াতুল হিন্দ

গাজওয়াতুল হিন্দ অর্থ হিন্দুস্থানের যুদ্ধ। যার পারিভাষিক অর্থ হিন্দুস্থানের তথা ভারতের মুশরিকদের সঙ্গে ইমানদার মুসলমানদের যুদ্ধ। আবার অনেকেই ভাবেন মুহাম্মাদ বিন কাশিমের সময় এই যুদ্ধটি হয়ে গেছে। তাদের এই ধারণাটা ভুল। কেননা, যদি সেই যুদ্ধটা হয়েই যেত তাহলে এতো দিনে খলিফা মাহদী সহ মরিয়াম তনয় ইসা (আ.) এ আত্বপ্রকাশ হয়ে যেত। আর এই যুদ্ধটা যেহেতু হিন্দুস্থান থেকে মুশরিকদের চিরতরে উৎখাতের যুদ্ধ। উদাহরণ স্বরূপ যেমনটি মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে আরব থেকে মুশরিকদের চিরতরে উৎখাত করা হয়েছে। আর সেজন্যই এই যুদ্ধটাকে গাজওয়া বলা হয়। আর ‘গাজওয়া’ সেই যুদ্ধকে বলা হয় যে যুদ্ধে আল্লাহর রসূল (ﷺ) স্বশরীরে উপস্থিত থেকেছেন। আর বাকী যুদ্ধগুলোকে ‘সারিয়া’ বলা হয়। আর এ যুদ্ধে আল্লাহর রসূল (ﷺ) স্বশরীরে উপস্থিত থাকছেন না। কিন্তু মক্কা বিজয়ের কিছু সাদৃশ্য এ যুদ্ধে রয়েছে। এ যুদ্ধ ব্যতিত তথা গাজওয়াতুল হিন্দ ব্যতিত আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর মৃত্যুর পরে আর কোন যুদ্ধকে গাজওয়া বলা হয় নাই। তবে হিন্দুস্থানের মুশরিকদের সঙ্গে মুসলমানদের সকল ধর্মীয় যুদ্ধগলোই গাজওয়াতুল হিন্দের অন্তর্ভুক্ত। আর গাজওয়াতুল হিন্দ শুরু হয়েছে ২৩ হিজরীতে খলিফা আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) এর শাসন আমল থেকে। আর এই গাজওয়াতুল হিন্দের চূড়ান্ত পর্যায়ে মুসলমানগণ পূর্ণাঙ্গ হিন্দুস্থান বিজয় করবে। যার ফলে হিন্দুস্থান থেকে মুশরিকরা চিরতরে উৎখাত হবে। আর সম্মানিত প্রতিশ্রুতি চূড়ান্ত যুদ্ধের সময় সম্পর্কে আল্লাহর রসূল (ﷺ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে।

হাদিস

১। হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেছেন, আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আল্লাহর রসূল (ﷺ) এমন একটা ফিতনাও বর্ণনা করতে বাদ রাখেননি যেগুলো পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত হবে এবং তার নেতৃত্বদানকারী সংখ্যা তিনশো বা তারও বেশি হবে। নবীজি (ﷺ) প্রতিটি ফেতনার আলোচনা কালে তার নেতার নাম, নেতার পিতার নাম, গোত্রের নাম উল্লেখ করেছেন। (সুনানে আবু দাউদ; মাহদী ও দাজ্জাল-আসেম ওমর, পৃঃ ৩৯৬)

২। হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি আমি জানিনা, আমার এই বন্ধুরা ভুলে গেছে নাকি স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ভুলে যাওয়ার ভান ধরে আছে। আল্লাহর কসম! আল্লাহর রসূল (ﷺ) কেয়ামত পর্যন্ত জন্ম লাভ করবে এমন একজনও নৈরাজ সৃষ্টিকারীর নাম উল্লেখ করতে বাদ রাখেননি। তিনি একজন নৈরাজ সৃষ্টিকারীর কথা উল্লে করার সময় আমাদেরকে তার নিজের, তার পিতার, তার গোত্রের নাম বলে দিয়েছেন। (সুনানে আবু দাউদঃ কিতাবুল ফিতান)

৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না পাঁচ নেতার আত্মপ্রকাশ ঘটবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ), তাদের চেনার উপায় কী? তিনি বললেন, তাদের একজন তোমাদের এ ভূমিতে জন্ম নিবে। যার নাম আমার নামের অনুরূপ। সে ক্ষমতায় থেকে ইসলামকে গলা চেপে হত্যা করবে। তথা ইসলাম ধ্বংসের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করবে। আর একজন অভিশপ্ত জাতির সন্তান। সে বিশ্ব শাসন করবে। আর তিনজন হবে হিন্দুস্থানের নেতা। যাদের একজন ক্ষমতায় থেকে ইসলাম ধ্বংসের সূচনা করবে। আর একজন ইসলাম ধ্বংসের প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতায় আসবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ) তারা তিনজন কী মুশরিক হবে? তিনি (ﷺ) বললেন, বরং তাদের একজন হবে নামে মুসলিম নারী শাসক। সে ক্ষমতায় এসে তার পূর্ব পুরুষের মূর্তি পূজা বৃদ্ধি করবে। অবশ্যই সেখানকার দূর্গম নামক অঞ্চল থেকে একজন দূর্বল বালকের প্রকাশ হবে। যার নেতৃত্বে হিন্দুস্থানের যুদ্ধে

মুসলিমদের বিজয় আসবে। (আখিরুজ্জামান আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ- ৯১; কিতাবুল আকিব- ৭৭)

৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত- রসূল (ﷺ) বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না পাঁচটি শাসকের আত্মপ্রকাশ হয়। যারা সর্বক্ষণে ইসলাম ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে। আমি বললাম, তারা কি মুশরিক হবে? তিনি (ﷺ) বললেন, না, তাদের দুইজন মুসলিম যাদের একজন তোমাদের এ ভূমিতেই জন্ম নিবে। যার নাম আমার নামের অনুরূপ। আর একজন নারী শাসক হবে। হিন্দুস্থানের পূর্ব অঞ্চলে সে ক্ষমতায় এসে পূর্ব পুরুষের মূর্তি পূজা বৃদ্ধি করবে। (আখিরুজ্জামান আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ- ৯২; কিতাবুল আকিব- ৭৯)

৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না পাঁচটি নেতার আত্মপ্রকাশ ঘটবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ), তাদের চিনার উপায় কী? তিনি (ﷺ) বললেন, তাদের একজন তোমাদের এ ভূমিতেই জন্ম নিবে। যার নাম আমার নামের অনুরূপ। সে ক্ষমতায় থেকে ইসলামকে গলা চেপে হত্যা করবে। আর তাদের একজন হবে অভিশপ্ত জাতির সন্তান। সে বিশ্ব শাসন করবে। আর তাদের তিনজন হবে হিন্দুস্থানের নেতা। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ) তারা তিনজন কী মুশরিক হবে? তিনি (ﷺ) বললেন, না, বরং তাদের একজন হবে নামে মুসলিম নারী শাসক। সে ক্ষমতায় এসে বা'আল মূর্তির পূজা বৃদ্ধি করবে। আর তাদের একজন ক্ষমতায় থেকে ইসলাম ধ্বংসের সূচনা করবে। আর একজন ইসলাম ধ্বংসের প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতায় আসবে। (আখিরুজ্জামান আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ- ৯০; কিতাবুল আকিব- ৭৮)

৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামত ততক্ষণ হবে না, যতক্ষণ না ইলিয়াস (আঃ) নবীর সময়ের মতো মানুষ বা'আল দেবতার পূজা করে। (কিতাবুল ফিরদাউস- ৮০৩)

বা'আল দেবতা সম্পর্কে কুরআনে আলোচনাঃ "নিশ্চয়ই ইলিয়াস (আ.) ছিল রসূল। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বললঃ তোমরা কি ভয় কর না? তোমরা কি বা'আল দেবতার এবাদত করবে এবং সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ

করবে। যিনি আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের পালনকর্তা?” (সূরা আছ-ছফ্‌ফাত, আয়াত ১২৩-১২৬)

৭। হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসবে যখন তারা বছরে দু-একবার বিপর্যস্ত হবে। যার একটি শুরু হবে বায়ু দ্বারা। মুশরিকদের দূর্গ ক্ষতিগ্রস্থের মাধ্যমে। আর শেষ হবে দূর্ভিক্ষের মাধ্যমে। আর এই দূর্ভিক্ষ শেষ হতেই মুশরিকরা একটি ফিতনা সৃষ্টি করবে। যার মোকাবেলার জন্য হিন্দুস্থানের পূর্ব অঞ্চল থেকে একদল মুসলিম ধাপিত হবে। কিন্তু মুশরিকরা তাদের এমনভাবে হত্যা করবে যেমনভাবে তোমরা এক নির্দিষ্ট দিনে পশুগুলোর উপর আল্লাহর নাম স্মরণ কর। ফলে তারা পরাজিত হবে। অনুরূপ, আর একটি মুসলিম দল মুশরিকদের দিকে ধাপিত হবে। তাদের সঙ্গে আল্লাহর সাহায্য থাকবে। তারাই বিজয়ী। একথা তিনি (ﷺ) তিনবার বললেন। তারপর বললেন, তাদের নেতা হবে দূর্বল। আহ্, প্রথম দলটির জন্য কতই না উত্তম হতো যদি তারা তাদের নেতাকে গ্রহণ করত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ) তারা তাদের নেতাকে গ্রহণ করবে না কেন? তিনি (ﷺ) বললেন, সে সময় তারা নিজেরাই নিজেদেরকে যোগ্য মনে করবে। (আখিরুজ্জামান আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ্– ১১৯)

কীভাবে হবে গাজওয়াতুল হিন্দ

যেহেতু উপরোক্ত হাদিসগুলোতে গাজওয়াতুল হিন্দের অনেক আলামতই উল্লেখ হয়েছে। যেহেতু আলামতগুলো প্রকাশ পাচ্ছে বোঝা গেলে আমাদের বুঝে নিতে হবে হিন্দের যুদ্ধ খুবই সন্নিকটে/কাছে। তাছাড়াও সাড়ে আটশত বছর পূর্বে লিখিত একটি গ্রন্থ শাহ নিয়ামতুল্লাহর কাসিদায়ে সাঁওগাঁত বা কাসিদা, যার অধিকাংশ কথাগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে এবং আশ-শাহরানের আগামী কথন কাসিদা থেকে হিন্দের যুদ্ধ কীভাবে হবে তার অনেক আলামত উল্লেখিত রয়েছে। যেগুলো শেষ জামানা নিয়ে বর্ণিত হাদিসের সমর্থন দেয়।

আর আমার (আল মাহমুদ জুয়েল বিন আব্দুল কাদির) যা ধারণাতিত তা থেকে আমি কিছু কথা উল্লেখ করছি। যদিও মানুষের অধিকাংশ ধারণা ভুল। শুরুতেই হিন্দুস্থানের মুশরিকরা দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে সন্দেহের

বীজ বপন ও উস্কানির মাধ্যমে একটি মুসলিম শক্তিকে দুই ভাগে বিভক্ত করবে। যা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ-পাকিস্তান বিভক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এরপর তারা দুর্বল দেশটির তথা সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখবে এবং পাকিস্তানের প্রতি শত্রুতা দেখাবে। এতে হিন্দুস্থান তথা ভারত-বাংলাদেশের সুসম্পর্ক অটল থাকবে। পরবর্তীতে মুশরিকরা সুযোগ বুঝে মুসলিমদের একটি শহর তথা পান্জাব কেন্দ্র জম্মু-কাশ্মীর হামলা করবে। যা ইতি মধ্যে শুরু করেছে। এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ মুসলমানদের উপর নানা চক্রান্তে হত্যা ও নির্যাতন শুরু করবে। এটাও শুরু করেছে অনেক আগেই। কিন্তু ভারতের মুশরিকরা মুসলমানদের সেই শহরটি দখল নিতে গিয়ে কঠিন পরাজয় ও অপদস্থ হবে। মুসলমানদের সেই শহর তথা কাশ্মীর মুশরিকরা দখলের সময় কাশ্মীরের মুসলমানদের পক্ষে বিশেষ করে আফগান মুজাহিদগণ সহ সকল মুজাহিদরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করে কাশ্মীর মুসলিমদের বিজয় আনবে। এমতাবস্থায় মুশরিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের পার্শ্ববর্তী বন্ধু রাষ্ট্র যেটা হবে মুসলিম দেশ- যে দেশের নেতা হবে নারী, অতএব, এই বাংলাদেশ দখলের উদ্দেশ্যে নানা কৌশল অবলম্বন করবে।

হামলার পূর্বে

অবশ্যই বাংলাদেশে প্রতিটি সেক্টরে মুশরিকদের কর্মীগুলোকে সেট করবে। যা ইতিমধ্যে অনেকাংশেই হয়েছে। এবং বাংলাদেশ ও ভারত প্রশাসনের মধ্যে একটি চুক্তি হবে। যেই চুক্তিতে শক্তভাবে লেখা থাকবে- বাংলাদেশের প্রশাসন ভারতে বিভিন্ন স্থানে শিবির স্থাপন করতে পারবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন সুবিধার্থে। এবং ভারতের প্রশাসনও বাংলাদেশে শিবির স্থাপন করবে একই শর্তে। এবং তাদের এই যুদ্ধের পথে যেন কোন রকম ছোট বড় সমস্যা সৃষ্টি না হয় সেজন্য তারা পূর্বেই পশ্চিম বাংলা তথা কলকাতাকে মুশরিকদের মনমত উগ্রবাদী একজন নেতাকে নিযুক্ত করবে। হতে পারে মমতাকে তারা কৌশলে নির্বাচনে পরাজিত করবে অথবা কোন দোষ দেখিয়ে গ্রেফতার কিংবা সরিয়েও দিতে পারে। আবার এমনও হতে পারে, তারা মমতাকেই কোন মাধ্যমে বশে আনতে পারে। এরপর যখন মুশরিকদের সকল পথ বাধা মুক্ত হবে তখন তারা কৌশলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে অবসর নিতে বলবে। এবং তার পরিবর্তে তার ছেলে অথবা বোনকে ক্ষমতায় বসাবে। এবং বিভিন্ন কৌশলে উস্কানি দেবে বিরোধী দলগুলোকে। ফলে

দেশে বিভিন্ন বিশৃংখলা দেখা দিবে। এমতাবস্থায় অবসর প্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য ভারতের কাছে সাহায্যের আবেদন জানাবে। ভারত এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করবে।

এ অবস্থায় বাংলাদেশের আলেম সমাজই বুঝে যাবে, হয়তে এটাই প্রতিশ্রুত গাজওয়াতুল হিন্দ। যে কারণে তারাও দেশের বিভিন্ন স্থানে মিটিং-মিছিল পোস্টারিং শুরু করবে। এবং মুশরিকদের মোকাবেলায় সংঘবদ্ধভাবে সামনে এগিয়ে যাবে। তখনই মুশরিকরা হামলা করে মুসলিমদের গণহত্যা করবে। নারীদের সম্মানহানি করবে, লুট-পাটসহ বিভিন্ন নৈরাজ সৃষ্টি করবে। আবার এমনও হতে পারে প্রধানমন্ত্রী অবসর না নিয়েই ক্ষমতায় থাকা অবস্থাতেই মুশরিকরা কৌশলে বাংলাদেশের নাস্তিক সম্প্রদায়কে দিয়ে মুসলমানদের কোন ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে। ফলে বাংলাদেশের মুসলিমরা ক্ষিপ্ত হয়ে আন্দোলন মুখী হতে পারে। ফলে প্রধানমন্ত্রী নিয়ন্ত্রণ না করতে পেরে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আনার জন্য ভারতের নিকট সাহায্যের আবেদন জানাবে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভারত এদেশে গণহত্যা শুরু করবে। এবং প্রধানমন্ত্রী তা বুঝে ওঠার আগেই ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে। ফলে এ হত্যাকাণ্ড কঠিন আকার ধারণ করবে। সেই সময়টাকে শাহ নিয়ামতুল্লাহ ও আস-শাহরান ‘দ্বিতীয় কারবালা’ বলে অ্যাখ্যায়িত করেছেন। এমন সময় একদল মুসলিম জামাত এই হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে সামনে অগ্রসর হবে। এবং তাদেরকেও গণহত্যা করা হবে। সে সময় আল্লাহর নুসরত প্রাপ্ত দলটি আল্লাহর দেখানো নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবে। এবং আল্লাহর নির্দেশনায় ইঙ্গিতে/ইশারায় আল্লাহর নাম নিয়ে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়বে। আর তাদের সঙ্গে আল্লাহর দয়া ও নুসরা থাকবে। তখন বাংলাদেশের প্রশাসন ও সাধারণ মানুষ তিন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। একদল ভারতের শক্তিকে ভয় পেয়ে তাদের নিকটই আশ্রই নেবে। একদল আল্লাহর নুসরাহ প্রাপ্ত দলের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। আর একদল দেশ রক্ষার জন্য দেশকে ভালোবেসে আল্লাহর নুসরাহ প্রাপ্ত দলের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।

যখন ভারতের সঙ্গে ভারতের পূর্ব (বাংলাদেশ) দিকের মুসলমানদের যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। তখন ভারতের পশ্চিম দিক থেকেও আফগান বিজয়ী গাজী

মুজাহিদগণ সহ অন্যান্য মুজাহিদগণও ভারতকে কঠিনভাবে আক্রমণ করবে। এবং অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ভারতের প্রতি আক্রমণে অংশ নেবে। এক পর্যায়ে ভারতের পশ্চিম দিকের মুজাহিদদের আক্রমণে অধিক ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় তাদের ঠেকানোর জন্য অধিক মনোযোগী হবে। এবং পূর্ব দিকের মুজাহিদদের আক্রমণের প্রতি অমনোযোগী হয়ে উঠবে। ফলে পূর্ব দিকের মুজাহিদগণ ২৫-৩০ খন্ডযুদ্ধে ভারতের অধিকাংশেরও বেশি বিজয় করবে। এমতাবস্থায় বুঝতে পেরে ভারত নাজেহাল পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে এবং সকল দিক হারিয়ে ফেলবে। এই অবস্থায় হিন্দুস্থানের মুশরিকদের সহযোগিতার জন্য ইহুদী-খ্রীষ্টানদের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলো যুদ্ধে অংশ নেবে। ফলে সেখানে পারমানবিক ক্ষেপণাস্ত্রসহ বড় বড় অস্ত্রগুলো ব্যবহার হবে। তা থেকে ভয়ংকর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হবে। সে ব্যপারে হাদিসে বর্ণিত আছে।

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন, অচিরেই ইহুদী-খ্রীষ্টানরা একে অপরকে অগ্নি নিক্ষেপ করবে। ফলে সকল মানুষই ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়বে। (<u>কিতাবুল ফিরদাউস- ১১৭৯</u>)
হযরত ফিরোজ দায়লামি (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আখেরী জামানায় ইমাম মাহদীর পূর্বে ইমাম মাহমুদ এর প্রকাশ ঘটবে। সে বড় যুদ্ধের শক্তির জোগান দেবে। তার জামানায় মহাযুদ্ধের বজ্রাঘাতে বিশ্বের অধ্বঃপতন হবে এবং বিশ্ব এই সময়ে ফিরে আসবে। সে তার সহচর বন্ধু সাহেবে কিরান বারাহ কে সাথে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করবে – যে বেলাল ইবনে বারাহ্ এর বংশধর হবে। তোমরা তাদের পেলে জানবে ইমাম মাহদীর প্রকাশের সময় হয়েছে। (<u>আসরে যুহর, ১৮৭ পৃঃ; তারিখে দিমাশাক, ২৩৩ পৃঃ; ইলমে তাসাউফ, ১৩০ পৃঃ; ইলমে রাজেন, ৩১৩ পৃঃ; বিহারুল আনোয়ার, ১১৭ পৃঃ</u>)
এছাড়াও আস-সুনানু ওয়ারিদাতুল ফিল ফিতান গ্রন্থে কোন দেশ কোন দেশের উপর পারমানবিক বোমা ব্যবহার করবে। সে ব্যপারে হাদিসের ইঙ্গিতে রয়েছে।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অধিকাংশ মানুষই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এ ব্যপারে কাজী মুফতি ইব্রাহিম বলেন, এখন দেখছো মানুষ আটশত (৮০০) কোটির বেশি অচিরেই দেখবে মানুষ ২০০-২৫০ কোটিতে এসেছে। কেননা,

এটা ইমাম মাহদীর আগমনের আলামত সমূহের একটি। (আমার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত আলোচনা সকল ব্যপারেই আল্লাহ ‘আলিম)।

যে বিষয়টি আমাদের অবশ্যই লক্ষণীয়

১। শেষ জামানা হাদিসগুলো নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। যে হাদিসটি ঘটে যায় তা অবশ্যই আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর কথা। তা মেনে নেওয়া আমাদের জন্য জরুরী।

২। শেষ যামানার হাদিসগুলো এমন যে, যখন সেই সময় আসে মনে হয় যে, হয়তো এই সময়ের জন্যই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। আবার যদি কেহ এ কথায় ভেবে বসে থাকে যে, যদিও এ হাদিসটি এ সময়ের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, তারপরও হয়তো আরো বাস্তব ভাবে মিলতে পারে। সামনে সময়ে তখনই আমরা ঐটাকে গ্রহণ করব। তবে এটা একটা বড় ভুল ও অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই না। কেননা প্রথমেই যখন তা বাস্তবের সঙ্গে মিলে গেছে তখন সেটিই মেনে নিয়ে সামনের সময়ের জন্য সকল প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে হবে। কারণ যদি সামনেরটা না হয়ে বর্তমানটাই সঠিক সময় হয় তবে তার জন্য কঠিন আফসোস আর পস্তানো ছাড়া কিছু থাকবে না। আর যদি বর্তমানটাই মেনে নেয় এবং সকল প্রকার প্রস্তুত থাকি অথচ এই সময় হাদিসের বর্ণিত সেই সময় নয়, তবে নিজেকে প্রস্তুত সহকারে সামনের সময়টাও পেয়ে যাব।

গাজওয়াতুল হিন্দের প্রস্তুতি

যে কোন যুদ্ধের বিজয় লাভের জন্য একই জিনিসের প্রয়োজন। যা মহান আল্লাহ তা’আলা পবিত্র কুরআনে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তা’আলা বলেন, “তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত রাখিবে। এ দ্বারা তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করিবে আল্লাহর শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং তাদের ছাড়াও অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জানো না। আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আল্লাহর পথে তোমরা যাহা ব্যয় করিবে উহার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হইবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হইবে না।” (সুরা আনফাল ৮:৬০)

(১) শক্তি (২) অশ্ববাহিনী, ঘোড়া-যানবাহন, অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত সৈনিক (৩) যাহা কিছু ব্যয়- অর্থ-সম্পদ ও সময়।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যাহারা ঈমান আনিয়াছে, হিজরত করিয়াছে ও আল্লাহর পথে জিহাদ করিয়াছে, তারাই প্রকৃত মুমিন, তাহাদের জন্যই ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।" (সুরা আনফাল ৮:৭৪)
(১) ঈমানী শক্তি; (২) হিজরত; যারা নির্যাতিত হয়ে অন্য অঞ্চল থেকে যুদ্ধের জন্য আসবে। এটা না আসলেও হবে কারণ এটা যুদ্ধের শর্ত নয়। (৩) আল্লাহর পথে জিহাদকারী মুজাহিদ যোদ্ধা; (৪) এই সকল যোদ্ধাও হিজরত করে আসা ব্যক্তিদের আশ্রয় দানকারী তথা নিরাপদ স্থান; (৫) তাদেরকে অর্থ সম্পদ ও থাকাসহ সকল বিষয়ে সাহায্য দানকারী দল। তাদেরকেই মহান আল্লাহ তা'আলা প্রকৃত মুমিন বলে অ্যাখ্যায়িত করেছেন।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদের মধ্যে যাহারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করিবেন। যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করিয়াছিলেন তাহাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাহাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন দ্বীনকে যাহা তিনি তাহাদের জন্য করিয়াছেন এবং তাহাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাহাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করিবেন। তাহারা আমার ইবাদাত করিবে, আমার কোন শরীক করিবে না। অতঃপর যাহারা অকৃতজ্ঞ হইবে তাহারা তো সত্যত্যাগী। (সুরা আন-নুর ২৪:৫৫)

(১) নিরাপত্তা; যেমন আল্লাহর রসূল (ﷺ) এক সাহাবাদের জন্য মদিনা ছিলো, আর এটা সকল যুদ্ধের জন্যই অতি জরুরী। যেখান থেকে আমীর যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন স্থানে সৈনিক পাঠাবেন এবং সৈনিকগণ দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধ শেষে সেই স্থানে গিয়ে একটু স্বস্তি পাবেন। যুদ্ধের মাঠে কোনো সৈনিক আহত হইলে অথবা কোন যুদ্ধে সৈনিকগণ পরাজিত হলে দ্রুত বেগে এসে সেখানে স্থান নিতে পারবে। সেই নিরাপদ স্থানে হিজরত কারী ও যুদ্ধাদের স্ত্রী-সন্তান, পিতা-মাতা, দুর্বল, অসুস্থ আত্মীয়-স্বজন যুদ্ধ চলাকলীন সময়ে অর্থাৎ চূড়ান্ত বিজয়ের আগ পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে। আর তা দেখে যুদ্ধরত মুজাহিদগন দীর্ঘ সময় যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে আসার পরেও মাঝে মধ্যে একটু

স্বস্থি ফিরে পাবে। উদাহরণ স্বরূপ, কোন অভাবী দরিদ্র শ্রমিক সারাদিন মাঠে খেতের কাজে শ্রম দেওয়ার পর বাড়িতে ফিরে এসে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে রাত্রী যাপন করতে এবং মনে সুখে আনন্দের শ্বাস ফেলতে পারে। আর এমন শ্রমিক যারা দিন শ্রম দিয়ে এসে রাতে এমন একটি গৃহে রাত্রী যাপন করতে হয়। যে গৃহের কোন ছাদ নেই, আর স্ত্রী-সন্তানদের কোন নিরাপত্তা নেই। অথবা তাদের রাত্রী যাপনের ঘরটাও ভাঙ্গা ও দূর্বল, অথবা দূরবর্তী অন্য এক জায়গায় কাজের জন্য শ্রম দিতে গিয়েছে এবং সেখানে তার থাকা খাওয়া ও জায়গাটা অনেক আরামদায়ক ও সুস্বাদু। সে যেকোন মাধ্যমে সংবাদ পেল তার নিজ এলাকায় কঠিন ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে অথচ সে যেখানে রয়েছে সেখানে ঝড় বৃষ্টি হলেও সে রয়েছে ইট পাথরের তৈরি দালান ঘরে যা তার জন্য নিরাপদ। তবে তার অন্তরে কেমন স্বস্তি থাকবে? সে কাজে কেমন অমনযোগী হবে? বুদ্ধিমান/জ্ঞানীদের জন্য তা উপলব্ধি করা জরুরী।

যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সমূহ

(১) জনশক্তি ও প্রস্তুত সৈন্য (২) যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় যানবহন ও সরঞ্জাম সহ সৈনিক (৩) নিরট ধনয় অর্থ-সম্পদ দাতা (৪) ঈমানী শক্তি (৫) যুদ্ধের আশেপাশে আশ্রয়দানকারী আনছার (৬) যোদ্ধাদের বিভিন্ন প্রটেকশন দানকারী আনছার (৭) নিরাপদ স্থান তথা যোদ্ধা প্রস্তুতি স্থান। সর্বপরি যুদ্ধের জন্য চারটি জিনিস অতি জরুরী।

(ক) জিহাদের মাঠে লড়াই করার জন্য মুজাহিদ (খ) যুদ্ধের জন্য সর্বপ্রকার সরঞ্জাম (গ) মুজাহিদদের বিভিন্নভাবে সাহায্যকারী আনছার (ঘ) যোদ্ধা তৈরি ও যোদ্ধাদের প্রিয়জনদের নিরাপত্তার জন্য নিরাপদ স্থান।

যুদ্ধে বিজয়ের প্রধান শর্ত

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা হীনবল হইওনা এবং দুঃখিতও হইওনা, তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও।" (সুরা আল-ইমরান ৩:১৩৯)

যুদ্ধের সেনাপতির গুণাবলী

(১) মুমিন হতে হবে (২) অধিক আল্লাহ ভীরু হতে হবে (৩) ধৈর্যশীল হতে হবে (৪) আনুগত্যশীল হতে হবে (৬) উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী হতে হবে।

সর্বশেষ বিষয়

যুদ্ধ অর্থ কৌশল। আর যে যত কৌশল অবলম্বন করতে পারবে তার বিজয় তত সুনিশ্চিত। আর যুদ্ধের সৈনিক সাজানোতে আছে জয়-পরাজয়। আর এই সাজানো এর কৌশল অবলম্বনে অবশ্যই আল্লাহর নুসরাহ অতিজরুরী। তা ব্যতিত কোন ক্ষুদ্র যুদ্ধেও বিজয় অর্জন অসম্ভব।

আর সম্মানিত ও অতি সম্মান লাভের প্রতিশ্রুত যুদ্ধ গাজওয়াতুল হিন্দ। আল্লাহ প্রদত্ত এ পূর্ব ঘোষিত যুদ্ধ। অবশ্যই এই যুদ্ধের আল্লাহ প্রদত্ত নেতার নেতৃত্বেই বিজয় অর্জন সম্ভব। নয়তো হাদিসে বর্ণিত প্রথম দলটির অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। আর আল্লাহ প্রদত্ত দলটি আল্লাহর নুসরাহ প্রাপ্ত হবে। আর কীভাবে গাজওয়াতুল হিন্দ হবে তা একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত আমীরই জানবে। যতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধের বিজয় না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধের কৌশল সকলের নিকট উন্মোচন না করে আমীরের নিকটেই গোপন রেখে কাজ করে যাওয়াটাই অধিক কল্যাণকর।

মহান আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছে করলে তার মনোনীত ব্যক্তিদের জালিমদের জনপদেও নিরাপদ স্থান দান করতে পারেন। অবশ্য এ কাজটি মানুষের কল্পনায় খুবই কঠিন হলেও মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট সহজ। যার দৃষ্টান্ত মূলক উদাহরণ 'আসহাবে কাহাফ' এর যুবকগণ। যাদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলা 'রাকীম' পর্বতের গুহায় নিরাপদ স্থান দান করেছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হইলে উহাদের হইতে ও উহারা আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদের ইবাদত করে তাহাদের হইতে তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাহার দয়া বিস্তার করিবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ ফলপ্রসূ করিবার ব্যবস্থা করিবেন।" (সূরা কাহফ ১৮:১৬)

যুদ্ধের বিজয়ের জন্য মধ্যম পন্থা প্রয়োজন। আমাদের মাঝে সবচেয়ে যে সমস্যাটা বেশি দেখা দেয় তা হলো- যুদ্ধ মানেই কঠোরতা, যুদ্ধ মানেই

শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করা। ফলে অনেকেই অধিক ত্বরাপ্রবণ হয়ে শত্রুর ঘাটিতে আক্রমণ করে বসে। অথচ তারা আক্রমণের পূর্বে বোঝার চেষ্টাও করে না যে, ঘাটিটা কি শত্রুর ছিল? না মিত্রর? যদি শত্রুর হয় তবে চূড়ান্ত যুদ্ধের পূর্বে শত্রুকে মিত্র করার কৌশল তৈরি করা যায় কিনা? আর চূড়ান্ত যুদ্ধের পূর্বেই শত্রু পক্ষকে সত্য গ্রহণের আহবান জানানো সুন্নাত। যদিও সত্য (ইসলাম) বর্তমান সময়ের সকলের নিকটেই পৌছে গেছে। কিন্তু যে বিষয়ে তাদের সাথে যুদ্ধে জড়ানো হচ্ছে সে বিষয়টা তাদেরকে অবগত করা। এই কাজটির ক্ষেত্রে আমরা অনেকাংশই পিছিয়ে রয়েছি। যার দরুন এমন কিছু ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যে, এক মুসলমান আরেক মুসলমানকে কোন নিয়ম পদ্ধতি ছাড়াই নিজে নিজেই কাফের ফতুয়া দিয়ে হত্যা বা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। অথচ, মুশরিকদের হত্যার ক্ষেত্রেও মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মুশরিকদের কেহ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তুমি তাহাকে আশ্রয় দিবে যাহাতে সে আল্লাহর বাণী শুনিতে পায়। অতঃপর তাহাকে তাহার নিরাপদ স্থানে পৌছইয়া দিবে, কারণ তাহারা অজ্ঞ লোক।" (সুরা তাওবাহ ৯:৬)

যখনই কেহ কোন নিয়ম নীতি অবলম্বন না করেই যুদ্ধের জন্য কোথাও আক্রমণ করেছে তখনই শত্রু বাহিনীর নিকট থেকে মুজাহিদিনদের অধিকাংশই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তার কারণ যুদ্ধের স্থানগুলোর আশে পাশে মুজাহিদদের জন্য না কোন আশ্রয় স্থল থাকছে, আর না কোন এমন ব্যবস্থা থাকছে যে, যখনই মুজাহিদগণ শত্রু বাহিনীর অভ্যন্তরে ঘিরাও হয়ে গেছে অল্প কিছু মাল-সামান নিয়ে তখনই শত্রু পক্ষকে পিছন থেকে আক্রমণের কোন ব্যবস্থা অথবা বাহিনী প্রস্তুত থাকছে। যার ফলে পরবর্তীতে কঠিন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে মুজাহিদদের। সে ক্ষতির থেকে পরিত্রানের উপায় নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিদের সচেতন ও কর্মীদের সঠিক আনুগত্য।

নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের সচেতনতা

অবশ্যই যে কোন সিদ্ধান্ত কার্যকর ও আক্রমণের পূর্বে নেতাদেরকে খুবই সচেতন হতে হবে। কেননা সেই মুহূর্তে তাদের সিদ্ধান্তের উপরেই অনেকাংশে যুদ্ধের লাভ-ক্ষতি স্থির থাকে। এ সময় নেতাদের একটু স্থির হয়ে এ কথা ভাবা জরুরী যে, যেই সিদ্ধান্ত আমরা কার্যকর করার প্রস্তুতি

নিচ্ছি, সেক্ষেত্রে আমাদের মুজাহিদ ভাইদের কতটুকু লাভ-ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। এক্ষেত্রে কুরআনে বর্ণিত একটি ঘটনা আমাদের স্মরণ রাখা জরুরী। তা হলো-

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যখন উহারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছিল তখন এক পিপীলিকা বলিল, হে পিপীলিকা বাহিনী! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর। যেন সুলাইমান এবং তাহার বাহিনী তাহাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষিয়ে না ফেলে।" (সুরা নামল ২৭:১৮)

উক্ত আয়াতের ঘটনা থেকে নেতাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হলে যেকোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের শুরুতেই কর্মীদের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া। কেননা এমন যেন না হয় যে, কর্মীরা দুনিয়ার সকল পিছুটান ফেলে নেতার সিদ্ধান্তের প্রতি নিজেদের মাল ও জান উৎসর্গে প্রস্তুত হয়েছে অথচ নেতার সিদ্ধান্তের কোন এক ভুলে অসংখ্য কর্মীর প্রাণ ঝরে গেল অথচ সেই সিদ্ধান্তের কর্মটা বাস্তবায়নও হলো না। আবার নেতাদের সচেতনাতেও কোন ফলপ্রসূ কাজ হয় না, যদি না কর্মীদের মধ্যে নেতার প্রতি সঠিক আনুগত্য না থাকে।

কর্মীদের সঠিক আনুগত্য

যে কোন বিষয়েই অবশ্যই নেতার প্রতি কর্মীদের সঠিক আনুগত্য থাকতে হবে। নচেৎ যেকোন কর্ম বাস্তবায়নই নেতা ও কর্মী উভয়কেই কঠিন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। যার সামাল দেওয়াটাই হবে দূর্বিসহ। কেননা অনেক সময় দেখা যায় অনেক কর্মীরা নিজেদের নেতাদের থেকে নিজেদেরকেই অনেক জ্ঞানী ও কৌশলী কল্পনা করে। ফলে নেতার হুকুম ছাড়াও কর্মীরা শুধু নিজেদের সিদ্ধান্তেই অনেক কর্ম বাস্তবায়ন করতে চায়। আবার কোন কোন কর্মী নেতার নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করেও কোন কর্ম বাস্তবায়নে অগ্রসর হয়। এটা এজন্য যে, তারা নেতার হুকুমের চেয়েও নিজের মনের সিদ্ধান্তকে অধিক সঠিক কল্পনা করে। যা পরবর্তীতে সেই মুজাহিদ সংগঠনসহ গোটা মুসলিম সমাজকেই ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়। যার ফলে পরবর্তীতে কোন ইসলামী সংগঠন সামনে অগ্রসর হবার সুযোগ পায় না। এর জন্য নেতাদের প্রতি কর্মীদের সঠিক আনুগত্য অপরিহার্য।

কীভাবে সমাধান

অবশ্যই এই সমস্যা থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। কেননা সকল মানুষই অন্যদের থেকে নিজেকেই অধিক জ্ঞানী মনে করে ফলে নেতা-কর্মীদের প্রতি গুরুত্ব না দিয়েই যে কোন কঠিন কর্ম বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। আর পরবর্তীতে ঝড়ে যায় অসংখ্য প্রাণ, ক্ষতিগ্রস্থ হয় কর্মীদের পরিবার। অথচ সেই মুহূর্তে নেতাদের ভূমিকা স্থীর/বুঝে ওঠতেই পারে না তখন কোন সিদ্ধান্তটা জরুরী। আবার বিভিন্ন সময়ে নেতাদের সিদ্ধান্ত ছাড়াই কর্মীরাই নিজেদের জ্ঞানী পরিচয় দিতে কোন কঠিন কর্ম বাস্তবায়নে অগ্রসর হয়। যার জন্য ক্ষতির সম্মুখীন উভয়কেই হতে হয়। যার আলোচনা পূর্বে করেছি। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান আল্লাহ প্রদত্ত নেতা। যিনি মহান আল্লাহর নির্দেশনায় ইঙ্গিতে যেকোন কঠিন কর্ম বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেবে।

যার সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। যেখানে কর্মী ও কর্মীদের পরিবারের প্রতি থাকবে নেতার সমান গুরুত্ব। সেখানে কর্মীদের কর্মঠতা দেখে বাছাই হবে না। বাছাই হবে মুসলিম হিসেবে। সেখানে শুধু কর্মীদের প্রতিই গুরুত্ব থাকবে না, গুরুত্ব থাকবে নারী-শিশু, বৃদ্ধ-মাজুর সহ সকলের প্রতিই সমানভাবে। আর কর্মীরাও অবগত থাকবে নেতার পক্ষ থেকে এ সিদ্ধান্ত শুধু নেতার নয়। এখানে মহান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনার ইঙ্গিত রয়েছে। সুতরাং, নেতার সিদ্ধান্তের বাহিরে নিজেদের কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে গেলে অবশ্যই ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং, যখন নেতা-কর্মী উভয়ই আল্লাহর নির্দেশনার ইঙ্গিতে কোন কর্ম বাস্তবায়ন করতে যাবে অবশ্যই তাতে কল্যাণ ও বারাকাত প্রাপ্ত হবে। যদি একদিক দিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পরীক্ষায় পতিতও হয় তবুও অন্য দিক দিয়ে আল্লাহর নুসরাহ সেখানে এসে পৌছবে। কেননা মহান আল্লাহ তা'আলা তার কোন বান্দার প্রতি অতিরিক্ত দ্বায়িত্বের ভার চাপিয়ে দেননা। এবং কোন বান্দার প্রতি জুলুম করেন না। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে উপরোক্ত আলোচনা বুঝার ও তদানুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমিন।

(হে আল্লাহ! আমি তোমার পূত-পবিত্রতা ঘোষণা করছি তোমার প্রশংসাসহ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমি ছাড়া সত্যিকারের কোন মাবুদ নেই। তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমারই নিকট তাওবা করি।)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোর সারসংক্ষেপ আলোচনা

বইটির ‘কিভাবে হবে গাজওয়াতুল হিন্দ’ পরিচ্ছেদে উল্লেখিত কথাগুলো যে একদম হুবহু সেরকমই মিলে যাবে সে কথা কিন্তু লেখক নিজেও বলেন নি। তবে তিনি ধারণা করে বলেছেন যে হিন্দের যুদ্ধটি কিভাবে, কোন পরিস্থিতিতে হতে পারে ও আগে-পরের রাজনৈতিক ও বৈশ্বিক রূপ কেমন হতে পারে। তবে দেখা যায় লেখকের কথার অনেক বিষয়ই প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে মিলে গেছে। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লিখিত অত্র বইটির সম্পূর্ণ আলোচনা পড়ার পর যে বিষয়গুলো সম্পর্কে পাঠক বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট নোট করতে পারেন তার মধ্যে রয়েছে ‘আফগান বিজয়ের কথা’। আফগান বিজয়ীদের হিন্দের যুদ্ধে ভূমিকা তথা এই জাতি বিজয়ী হবে তা ২০২০ সালেই এই বইতে উল্লেখ ছিল অথচ ২০২১ সালের আগস্ট মাসে আফগান বিজয় হয়, আর সেই বিজয় ছিল এক হটাত আকস্মিক ঘটনা! এরপর বাংলাদেশে আওয়ামীলীগের মত শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দলের পরাজয় ও প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ বিষয়টি এবং তার বন্ধু দেশে আশ্রয়ের বিষয়টিও মিলে গেছে! তিনি যদিও ধারণাতীতভাবে কথাগুলো বইতে লিখেছিলেন, কিন্তু এভাবে বাস্তবে রূপ নেওয়ার বিষয়টিকে লেখকের ফিরাসত অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি বলা যেতেই পারে! এরপরে দেশে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করায় লিপ্ত থাকার বিষয়, নাস্তিকদের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর বিষয় এবং বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু কর্তৃক মুসলিমরা নির্যাতিত-নিপীড়িত, হত্যা হওয়ার বিষয়গুলো বেড়ে যাওয়ার কথাও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যা এখন আমরা স্পষ্ট দেখতে পারছি আমাদের চোখের সামনে! বইতে লিখিত পরের প্রেক্ষাপট বর্ণনায় সেই সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে যোগসাজশে বন্ধু দেশের ষড়যন্ত্রে এ দেশে যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি হতে পারে বলেও তিনি উল্লেখ করেন এবং তখন দেশের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা দিয়ে সাধারণ মানুষদেরকে একটি উপযুক্ত সতর্কবার্তা তিনি দিয়ে গেছেন। তা হচ্ছে হাদিসের বলা সেই ভবিষ্যৎবাণী- “গাজওয়াতুল হিন্দ”।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ এর লিখিত বইসমূহঃ

---

১. সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ
২. তা'লিমুত তাওহীদ
৩. তাওহীদ আল ইবাদাহ
৪. ইসলামের বুনিয়াদ শিক্ষা
৫. রসূল ﷺ এর শিখানো ছলাত
৬. ইসলাম পালনের মূলনীতি
৭. আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে
৮. মাসজিদে যিরার (লিখিত বক্তব্য)
৯. মুক্তির পয়গাম
১০. ইসলামে সামাজিক জীবন
১১. তোমার লক্ষ্য যেন হয় জান্নাত
১২. দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নারীদের ভূমিকা
১৩. ইসলামে মৃত ব্যক্তিদের সম্পদ বণ্টন নীতি
১৪. আল্লাহর পথের পথিক
১৫. গাজওয়াতুল হিন্দের সংক্ষিপ্ত আলোচনা
১৬. সীরতে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল আরাবী ﷺ